একক ৩ ❑ ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের পরিবর্তনশীল ধারা—আর্থিক নিষ্ক্রমণ—ঊনিবংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ : ব্রিটিশ আধিপত্যের প্রভাব—অবশিল্পায়ন

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ প্রারম্ভিক কথা

৩.৩ কোম্পানির বাণিজ্য

৩.৪ কোম্পানির বাণিজ্য ও এজেন্সি হাউস

 ৩.৪.১ কোম্পানির বিনিয়োগ ও ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ভূমিকা

৩.৫ একচেটিয়া কারবারের প্রভাব : ভারতীয় বাজার ও উৎপাদক

৩.৬ পরিবর্তনশীল বাণিজ্যের ধারা

৩.৭ অবশিল্পায়ন

 ৩.৭.১ অবশিল্পায়ন ও সুতিবস্ত্র শিল্প

৩.৮ আর্থিক নিষ্ক্রমণ বা সম্পদ নির্গম

৩.৯ সারাংশ

৩.১০ অনুশীলনী

৩.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করতে পারবেন—

- ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আধিপত্যের প্রভাব অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কীভাবে কাজ করেছিল।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য নীতি ও বিনিয়োগ।
- ইংরেজ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য।
- কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য।

- পরিবর্তনশীল বাণিজ্যের ধারা।
- অবশিল্পায়ন।
- আর্থিক নিষ্ক্রমণ।

৩.১ প্রস্তাবনা

ইংরেজরা ভারতবর্ষে এসেছিল বণিকরূপে কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শাসক হিসেবে—রাজনৈতিক ইতিহাসে এই বহুপ্রচলিত কথাটি তথ্যভিত্তিকভাবে প্রমাণিত। ইংরেজ শাসনের অর্থনৈতিক প্রভাবের একটি দিক এই এককটিতে আলোচিত হয়েছে। ইংরেজরা ভারতবর্ষকে পুরোপুরি ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আনার বহুপূর্বে ভারতবর্ষকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই। কীভাবে ইংল্যান্ডের প্রয়োজন অনুসারে ভারতীয় অর্থনীতি ও সম্পদের উৎসগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছিল এই এককটিতে তাই আলোচনা করা হয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিনিয়োগ নীতি, ইংরেজ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য, ১৮১৩-তে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অবসান সমস্তই নির্ধারণ করা হয়েছিল ইংল্যান্ডের স্বার্থের কথা ভেবেই। ভারতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ক্ষতিকর অভিঘাত সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতীয় কুটিরশিল্পের ধ্বংস ও ভারতীয় সম্পদের উৎসের ক্রমিক নির্গমন এরই ফল। এই এককটি পাঠ করলে কীভাবে তা ঘটেছিল তা জানা যাবে।

৩.২ প্রারম্ভিক কথা

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অপকেন্দ্র শক্তি অত্যন্ত শক্তিশালী ও কেন্দ্রীভূত মোগল সাম্রাজ্যকে ভেঙে টুকরো করেছিল, ফলে কতকগুলি আঞ্চলিক শক্তির উত্থান ঘটেছিল। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করার পর ভারতীয় ইতিহাসের অন্য এক অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছিল। আমাদের দেশে ব্রিটিশ শোষণের পরপর তিনটি পর্ব ছিল বলে অনেক ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন। এর প্রথম পর্বটি ছিল ১৭৫৭ থেকে ১৮১৩-র বণিক পর্যায়। সরাসরি লুঠ ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসা ছিল এই পর্বের লক্ষণ। ইংল্যান্ডে ও ইউরোপে রপ্তানির জন্য ভারতে তৈরি মাল যথেষ্ট কম দামে কিনে ও তা থেকে উদ্বৃত্ত বিনিয়োগ করে এটি চলেছিল। ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব নাটকীয়ভাবে পাল্টে দিয়েছিল ব্যবসার পুরো ধাঁচটাই। ১৮১৩ থেকে ১৮৫৮ অবধি সময়কে বলা যেতে পারে অবাধ ব্যবসার, শিল্পবাদী শোষণের ধ্রুপদী যুগ। ভারতের চিরায়ত হস্তশিল্পকে এসময়ে উপড়ে ফেলা হল এবং অচিরেই তাকে ম্যানচেস্টার থেকে আনা কাপড়ের বাজারে ও কাঁচামালের উৎসে পরিণত করা হয়। এই এককটি পড়লে জানা যাবে কিভাবে ব্রিটিশ শোষণের অর্থনৈতিক নাগপাশ ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল যার অবশ্যম্ভাবী ফল হয়েছিল ভারতীয় হস্তশিল্পের ধ্বংস ও পরবর্তী পর্যায়ের আর্থিক নিষ্ক্রমণ।

৩.৩ কোম্পানির বাণিজ্য

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতের বহির্বাণিজ্য এবং অন্তর্বাণিজ্যে প্রধানত তিন ধরনের বণিকরা লিপ্ত ছিল। বিভিন্ন ইওরোপীয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অর্থাৎ ইংরেজ, ফরাসি, ওলন্দাজ ইত্যাদি চার্টাড কোম্পানিগুলি, আর্মেনিয় বণিকদের মতো এশীয় বণিকেরা এবং ভারতীয় বণিকগণ। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট, ফারুকশিয়ারের ফরমান ইংরেজ কোম্পানিগুলিকে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়ে তাদের অন্যান্য বণিকদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। ফরমানে বলা হয়েছিল যে, ইংরেজ কোম্পানি মোগল সাম্রাজ্যে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার বিনিময়ে সম্রাটকে বছরে ৩,০০০ টাকা নজরানা দেবে। যদিও অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধেই মোগল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়তে থাকে, বাণিজ্যে কিন্তু অবক্ষয়ের চিহ্ন দেখা যায়নি। ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দে কেবল ব্রিটেনই ৪,৯৩,২৫৭ পাউন্ড মূল্যের ভারতীয় পণ্য নিজ দেশে আমদানি করেছিল। ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেন আমদানি করেছিল ১,০৫৯,৭৫৯ পাউন্ড মূল্যের ভারতীয় পণ্য। বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে এই ব্রিটেনকৃত ভারতীয় পণ্যের আমদানি দাঁড়ায় ১,০৯৮,৭১২ পাউন্ড। অপরদিকে ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারত ব্রিটেনের কাছ থেকে বুলিয়নের মাধ্যমে ১৭,০৪৭,১৭৩ পাউন্ড লাভ করেছিল।

কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের দুর্বলতার ফলে ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দের ফর্মানকে আইন অনুযায়ী প্রয়োগ করা সম্ভভব হয়নি। কোম্পানির কর্মচারীরা প্রায়ই দস্তকের অপব্যবহার করে ফর্মানের শর্ত লঙ্ঘন করত। পলাশীর বিজয় বাংলায় ব্রিটিশ প্রভাবকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করল, ফলে কোম্পানির কর্মচারীরা অন্তর্বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও শুল্ক ছাড়ের সুযোগ নিতে লাগল অথচ ফারুখশিয়ারের ফর্মানে কোম্পানির নিজস্ব আমদানি-রপ্তানির ওপরই কেবল শুল্ক ছাড়ের সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোম্পানির কর্মচারীদের পুরো শুল্ক দিতে হবে। দস্তকের অপব্যবহারের ফলে ভারতীয় বণিকগণ গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল কারণ তাদের আগের মতোই চড়া হারে শুল্ক দিতে হচ্ছিল।

১৭৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাণিজ্যিক দিক দিয়ে বাংলা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে পরিণত হয়েছিল। ইংরেজ কোম্পানির বাংলা বিজয় এবং ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার দেওয়ানি লাভ বাংলার বাজারের ওপর ইংরেজ কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। ফলে বাংলার উৎপাদকেরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী তাদের উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রি করার সুযোগ ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য নির্দিষ্ট কোম্পানির কর্মচারী ও গোমস্তাদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য থাকত এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্যও ধার্য করে দিত কোম্পানির কর্মচারীরা। দেওয়ানি লাভের পর অর্থাৎ বাংলার রাজস্বের ওপর নিরঙ্কুশ অধিকার লাভ করার ফলে ইংরেজ কোম্পানির বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আরও একটি সুদুরপ্রসারী পরিবর্তন দেখা দিল।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের আগে ভারতে বুলিয়ন আমদানি করে ইংরেজ কোম্পানি তার রপ্তানি বাণিজ্য চালাত। কিন্তু দেওয়ানি লাভের পরে রপ্তানিযোগ্য ভারতীয় পণ্য ক্রয়ের জন্য ইংরেজ কোম্পানিকে আর বুলিয়ান আমদানি করতে হয়নি। কারণ কোম্পানি তখন থেকে বাংলার রাজস্ব দিয়েই তার বার্ষিক বিনিয়োগ করত। বাংলা কেবলমাত্র ইওরোপীয় বাজারে প্রধান পণ্য সরবরাহকারীই ছিল না, কোম্পানি চীন থেকে যে চা ও রেশম কিনত তার জন্য বুলিয়ন যোগান দিতেও বাংলা বাধ্য হয়েছিল। রৌপ্যমুদ্রা রপ্তানি হয়ে যাওয়ার অবশ্যম্ভভাবী কুফল হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে টাকার যোগান হ্রাস পেয়েছিল।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকেই ভারতের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতীয় বাণিজ্য পুঁজির পরিমাণ কমতে থাকে। ইংরেজ কোম্পানি ও ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত ইংরেজ বণিকদের এজেন্সি হাউসগুলির মাধ্যমে বিনিয়োগকৃত পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধির ফলেই ভারতীয় বণিকদের পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল।

১৭৭৯ থেকে ১৭৮৬-র মধ্যে শিল্পবিপ্লবজাত নানা নতুন প্রযুক্তির উদ্ভবের ফলে ১৭৮৭ নাগাদই ল্যাংকাশায়ার সূতীবস্ত্র শিল্প ভারতীয় শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারছিল। তবে সূক্ষ্মতম মসলিনবস্ত্রের ক্ষেত্রে ভারতীয় বস্ত্রের কোনো তুলনাই ছিল না। বস্ত্রশিল্পে বিনিয়োগকারী ইংল্যান্ডের শিল্পস্বার্থ চাইছিলো ভারতবর্ষ থেকে সূক্ষ্ম সূতো ও সূতীবস্ত্র রপ্তানির পরিবর্তে তুলো আমদানি করতে। ১৭৯২-৯৩-এ এই দাবী আরও জোরদার হয়েছিল এবং ম্যানচেস্টারের বস্ত্রশিল্পে বিনিয়োগকারীগণ চাইছিল ভারতীয় সূতিবস্ত্র আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হোক। কিন্তু এই দাবির সঙ্গে আরও অন্যান্য গোষ্ঠীর দাবী ও স্বার্থও প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছিল, ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের সনদের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এই সমস্ত স্বার্থও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের সনদের মাধ্যমে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত বণিকেরা কতগুলি সুবিধা আদায় করেছিল। এই সনদে বলা হল যে তারা ৩,০০০ টন ওজনের পণ্য পর্যন্ত কোম্পানির জাহাজে আমদানি-রপ্তানি করতে পারবে। কিন্তু এর জন্য যে ভাড়া তাদের দিতে হবে তার হার ছিল যথেস্ট বেশি। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে একটি আইনের মাধ্যমে গভর্নর-জেনারেল ওয়েলেসলি বেসরকারি ইংরেজ বণিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য একটি আইন করেন। এই আইন অনুসারে ব্যক্তিগত ইংরেজ বণিকরা ভারতীয় জাহাজে করে ব্রিটেনে পণ্য রপ্তানি করার অনুমতি পায়। এই পদক্ষেপ ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করেছিল। বাংলা থেকে ইংরেজ বণিকরা অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক পর্বে মূলত নীল, কাঁচা রেশম, সূতি ও রেশমী বস্ত্রের থান, কাঁচা তুলো, চিনি, শস্য ও সোরা ইউরোপের বাজারে রপ্তানি করত। এই সময় সূতি ও রেশম বস্ত্রের রপ্তানি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নীল, কাঁচা তুলা এবং আফিমের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংল্যান্ড যে পরিমাণে পণ্য ভারতে রপ্তানি করত, তার ৩৩ শতাংশই আসত ভারতে। বুলিয়ন ছাড়া ইংরেজরা যে সব পণ্য ভারতে রপ্তানি করত সেগুলি হল মদ, স্পিরিট, কাচ, ছুরি, কাঁচি, লোহা, পশমের বস্ত্র, বই এবং টুপি। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানির নীতি ছিল ইংল্যান্ডের শিল্পজাত পণ্য যত বেশি সম্ভভব ভারতে রপ্তানি করা, যাতে ভারতীয় ভোক্তারা ঐ সমস্ত পণ্য ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতীয় বাণিজ্যদ্রব্য ক্রয়কেই কোম্পানির "বিনিয়োগ" বলা হত। বাংলায় সপ্তদশ শতকের শেষে ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে এই বিনিয়োগের মাধ্যম মূলত ছিল দাদ্‌নি বণিকেরা। এই বণিকগণ কোম্পানির কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে তাঁতিদের দিত নিয়মিত দ্রব্য সরবরাহের জন্য। এছাড়াও নগদ দ্রব্য ক্রয়ের ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু দাদ্‌নি বণিকদের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে এই বিনিয়োগ অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নানা কারণে পরিত্যাগ করা হয়েছিল।

পরিবর্তে ভারতীয় গোমস্তা বা কোম্পানির দালাল নিয়োগ করা হয়েছিল যারা কোম্পানির ইউরোপীয় কর্মচারীদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে কোম্পানির জন্য দ্রব্য ক্রয় করত। পরবর্তী বিভাগে এ বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা প্রসঙ্গক্রমে আসবে।

৩.৪ কোম্পানির বাণিজ্য এবং এজেন্সি হাউস

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে ভারতের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানি এবং ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত ইংরেজ বণিকরা। কোম্পানির দাদ্‌নি ব্যবস্থা অবলুপ্তির ফলে ব্যক্তিগত বাণিজ্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। বৈদেশিক বাণিজ্যের বৃদ্ধির ফলে ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত ইংরেজ কর্মচারীরা তাদের নিজস্ব বাণিজ্য সংস্থা গড়ে তুলতে আরম্ভ করেছিল। এই সংস্থাগুলিকে বলা হত "এজেন্সি হাউস"। এই এজেন্সি হাউসগুলি ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত ইংরেজ কর্মচারীদের টাকা স্বদেশে প্রেরণ করার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ চীনের সঙ্গে আফিন বাণিজ্য শুরু হওয়ার সময় বাংলায় কম করে ১৫টি এজেন্সি হাউসের অস্তিত্ব ছিল এবং ঐগুলি অধিকাংশই ছিল ইংরেজ নিয়ন্ত্রিত। ভারতে ব্রিটিশ ব্যক্তিগত বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এই এজেন্সি হাউসগুলি। যদিও মূলত এই সংস্থাগুলি ছিল বাণিজ্য কুঠি কিন্তু একই সঙ্গে এগুলি ব্যাংকার, হুন্ডির দালাল, জাহাজের মালিক, বিমার দালাল ও পণ্য সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করত। নীল, আফিম এবং উপকূল বাণিজ্য ইংরেজ ব্যক্তিগত বাণিজ্যের নতুন ক্ষেত্র খুলে দিয়েছিল।

এজেন্সি হাউসগুলি গড়ে ওঠার আগে দেশীয় বণিকরাই ইংরেজদের পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দালালের কাজ করত। এজেন্সি হাউসগুলি গড়ে ওঠার পর ভারতের বাণিজ্যিক অর্থনীতিতে ভারতীয় বেনিয়ানদের বা দালালদের গুরুত্ব ক্রমশ কমতে থাকে৷ এর ফলে অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকেই ভারতীয় বাণিজ্যে ভারতীয় পুঁজির পরিমাণ কমতে থাকে ও ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত ইংরেজ বণিকদের পুঁজির পরিমাণ বাড়তে থাকে। ভারতীয় বাণিজ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বেনিয়ানদের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে আসে।

১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গাল। এর আগে পর্যন্ত এজেন্সি হাউসগুলিই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ইংরেজ বণিক ও নীল আবাদকারীদের কাছে ব্যাঙ্কের কাজ করত। আলেকজান্ডার অ্যান্ড কোম্পানির মতো এজেন্সি হাউস নোট ছাপাবার অধিকারও লাভ করেছিল। ১৭৮০ ও ৯০-এর দশকে নীলচাষ আরও হয়েছিল, ইংরেজ বণিকদের চীনে আফিম বিক্রির লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল এবং জাহাজ ব্যবসারও বিকাশ ঘটেছিল, ফলে এজেন্সি হাউসগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকল। ১৮৩০-এর গোড়ার দিকে একটি এজেন্সি হাউসই হয় সম্পূর্ণ মালিক হিসেবে নয় অংশীদার হিসেবে অন্তত ৫৬টি নীল তৈরির কারখানার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই সময়ে বাংলার আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ওপর কয়েকটি এজেন্সি হাউসের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এজেন্সি হাউসগুলির প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে কোম্পানির সরকার। বৃহত্তর এজেন্সি

হাউসগুলিকে কোম্পানির সরকার ঋণদান করে। কোম্পানি সরকারের বাজেট ঘাটতি হওয়া সত্ত্বেও এজেন্সি হাউসগুলির আর্থিক সঙ্কটের সময় সরকার সেগুলিকে উদার হাতে ঋণদান করতে থাকে। এই সরকারি সাহায্যদানের পিছনে কতকগুলি জোরালো কারণ ছিল। প্রথমত, এজেন্সি হাউসগুলির বণিকদের স্বার্থের সঙ্গে প্রশাসনিক ও সামরিক কাজে লিপ্ত কর্মচারীদের স্বার্থ সংযুক্ত ছিল। দ্বিতীয়ত সরকারি রাজস্ব অনেকটাই ইংরেজ বণিকদের সাফল্য ও ব্যর্থতার ওপর নির্ভর করত।

১৮৩০ থেকে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে একের পর এক এজেন্সি হাউসগুলি কিন্তু ভেঙে পড়তে থাকে। এজেন্সি হাউসগুলির ধ্বংসের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে ইংরেজ বণিকদের ফাটকা কারবার যা মূলত নীল তৈরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ১৮০-এর দশকে ইংল্যান্ডের বাজারে যে আর্থিক মন্দা দেখা দেয় তার ফলে ইংল্যান্ডের নীলের ও অন্যান্য পণ্যের বাজারের প্রভূত ক্ষতি হয়। অবশ্যম্ভাবীভাবে এজেন্সি হাউসগুলি আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে পড়ে। নীলের কারবারের ক্ষতি এজেন্সি হাউসগুলির ধ্বংসের অন্যতম কারণ ছিল। এজেন্সি হাউসগুলির ভাঙনের প্রভাব মারাত্মকভাবে ব্যাঙ্কগুলির ওপর পড়লো। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে পামার কোম্পানি ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গেই উক্ত কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক ভেঙে পড়ে। ম্যাকিনটস কোম্পানির পতন ও কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের পতন প্রায় একই সঙ্গে হয়েছিল। এমনিতেই ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় দেশী বণিকদের ভূমিকা ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ক্রমক্ষীয়মাণ হয়ে পড়ছিল। ব্যাঙ্কগুলি থেকে যারা ঋণ পায় তাদের মধ্যে ভারতীয় নাম বিরল হয়ে দাঁড়ায়। ত্রিশের দশকে এজেন্সি হাউসগুলির ব্যবসার মন্দাতে বাংলার বণিকরাও অনেক খেসারৎ দেয় এবং তারা ইংরেজ চালিত ব্যবসা থেকে সরে যেতে থাকে। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার বাইরে, টাকার বাজারেও দেশি পুঁজির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল। এর জন্য দায়ী ছিল ইংরেজ পুঁজির স্বার্থের খাতিরে কোম্পানি সরকারের হস্তক্ষেপ। বহুবার কোম্পানি রাজস্ব থেকে কম সুদে ইংরেজ বণিকদের ঋণ দেয় এমন এক সময়ে যখন পুঁজির বাজারে টানাটানির দরুন ভারতীয় বণিকরা উঁচু হারে সুদ আদায় করার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু কোম্পানির হস্তক্ষেপের ফলে তা সম্ভভব হয়নি। পূর্বভারতে এভাবে বিদেশী পুঁজির আধিপত্যের ভিত্তি তৈরি হয়েছিল বলে অনেক ঐতিহাসিকই মনে করেন।

৩.৪.১ কোম্পানির বিনিয়োগ ও ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ভূমিকা

১৭৫৭ থেকে ১৮১৩ এই সময়ের মধ্যে ব্রিটেন শোষণ চালিয়েছিল দুটি উপায়ে—ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার দ্বারা এবং এই বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত ইওরোপীয় বণিক দলের সক্রিয় সহায়তা দ্বারা কোম্পানির চীন বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই সহায়তা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা কোম্পানি থেকে প্রাপ্ত তাদের বেতন, যেহেতু তা যথেষ্ট কম ছিল, ব্যক্তিগত বাণিজ্যের মাধ্যমে পরিপূরণ করার প্রচেষ্টা করত। আগে বলা হয়েছে যে ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে ফারুকশিয়ারের কাছ থেকে পাওয়া ফরমানের জোরে ইংরেজ কোম্পানি বাণিজ্যে পণ্যের ওপর শুল্ক ছাড় পেয়েছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোম্পানির কর্মচারীদের পুরো শুল্ক দিতে হবে একথাও বলা শর্ত লঙ্ঘন করে বিনাশুল্কে তাদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য চালাতে থাকে।

১৭৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাণিজ্যিক দিক দিয়ে বাংলা সবচেয়ে গরুত্বপূর্ণ প্রদেশে পরিণত হয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধ এবং ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার দেওয়ানি লাভ ইংরেজ কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বাংলার বাজারের ওপর এই একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখতে কোম্পানি অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণও কাজে লাগিয়েছিল ফলে বাংলার উৎপাদকগণ নিজেদের ইচ্ছানুসারে তাদের পণ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রি করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের আগে ভারতে বুলিয়ন আমদানি করে ইংরেজ কোম্পানি তার বাণিজ্য চালাত। বছরে এই বুলিয়ন আমদানির পরিমাণ ছিল ৭ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ পাউন্ড। দেওয়ানি লাভের পরে রপ্তানিযোগ্য ভারতীয় পণ্য ক্রয়ের জন্য ইংরেজ কোম্পানিকে আর বুলিয়ন আমদানি করতে হয়নি। কোম্পানি বাংলার রাজস্ব দিয়েই তার বার্ষিক বিনিয়োগ করতে শুরু করেছিল।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। কোম্পানির কর্মচারীরা এই আয় দেশে পাঠানো নিয়ে সমস্যায় পড়ে। প্রচলিত প্রথা ছিল এইরকম যে, ইংরেজ বণিকরা তাদের অর্জিত মুনাফা ভারতে ইংরেজ কোম্পানির তহবিলে জমা রাখবে; পরিবর্তে তারা পেত বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ। দেশে ফিরে তারা কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টরস্-এর কাছ থেকে এই বিল মারফৎ সে টাকা ভাঙিয়ে নিতে পারত। কিন্তু এইভাবে পাঠানো টাকার বিনিময় হার কোম্পানির ইংরেজ বণিকদের কাছে আদৌ লাভজনক ছিল না। এইজন্য তারা ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি ইউরোপীয় কোম্পানির মাধ্যমে এই টাকা পাঠাতে শুরু করে। ফল হল এই যে, এই কোম্পানিগুলিও ইংরেজ বণিকদের টাকার ওপর নির্ভর করতে শুরু করল এবং ইংরেজ বণিকদের গচ্ছিত টাকা বিদেশি কোম্পানিগুলি ভারতে তাদের পণ্য ক্রয় করার জন্য বাণিজ্যিক পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করতে লাগল। আগেও বলা হয়েছে যে এর ফলে বিদেশি কোম্পানিগুলি ইউরোপ থেকে সোনা বা রূপা অর্থাৎ বুলিয়ন আমদানি বন্ধ করে দিতে লাগল।

আগের বিভাগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের সনদের মাধ্যমে ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত বণিকরা কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিয়েছিল। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দের অপর একটি আইনের দ্বারা বেসরকারি ইংরেজ বণিকদের ভারতীয় জাহাজে পণ্য রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হয়। এর ফলে ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যের বৃদ্ধি ঘটে। বাংলাদেশ থেকে ইংরেজ বণিকগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে মূলত নীল, কাঁচা রেশম ও সূতি বস্ত্রর থান, কাঁচা তুলো, চিনি, শস্য ও সোরা ইউরোপের বাজারে রপ্তানি করত। এইসময় সূতি ও রেশম বস্ত্রের রপ্তানি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ১৮১২ নাগাদ নীল, কাঁচা তুলো এবং আফিমের রপ্তানি বৃদ্ধি পেতে লাগল।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৭০-এর দশকে চীনের ক্যান্টন বন্দর থেকে বছরে ৬ মিলিয়ন পাউন্ড চা কিনত। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৩৫ মিলিয়ন পাউন্ড। ১৭৭০-এর দশক পর্যন্ত ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চীন থেকে চা কিনত মূলত ইংল্যান্ডের রূপো দিয়ে। কিন্তু ১৭৯০-এর দশকে ইংরেজ কোম্পানি কর্তৃক বাংলার বাণিজ্যের ওপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর দেখা গেল যে ইংরেজ কোম্পানি চীনে সমগ্র রপ্তানির মাত্র ৮.৭ শতাংশ ছিল ইংল্যান্ডের

রূপো, ৩৭.২ শতাংশ ছিল ব্রিটিশ পণ্য এবং ৫৪.১ শতাংশ ছিল ভারতীয় পণ্য। ১৮৩০-এর গোড়ার দিকে ইংরেজ কোম্পানি চীনের সঙ্গে বাণিজ্য চালাত প্রায় ভারতীয় পণ্যের মাধ্যমেই। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার শেষ হয়ে গেলে বেসরকারি ব্যক্তিগত বণিকদের মুনাফার অংশ স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পেতে লাগল। ব্রিটেনের বদলে চীনে ভারতীয় পণ্য রপ্তানি করে তারা আরও লাভবান হচ্ছিল। ফলে কোম্পানি এবং ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত বণিকরা উভয়েই চীনে প্রচুর আফিম রপ্তানি করে মুনাফা অর্জন করতে লাগল। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারত থেকে চীনে প্রতি বছর গড়ে ১২,২৬১ চেস্ট আফিম রপ্তানি হত। ১৮৩১-১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারত থেকে চীনে আফিম রপ্তানির বার্ষিক গড় পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৪৩,৫৪৮ চেস্ট। চীনের সঙ্গে এই আফিমের ফলাও ব্যবসা দুদিক থেকে ইংরেজদের লাভের কারণ হচ্ছিল। একদিকে, আফিম বাণিজ্য থেকে কোম্পানি পেত প্রচুর রাজস্ব, অপরদিকে আফিম ব্যবসায় আহৃত বিপুল মুনাফার একটা অংশ ইংরেজ বণিকরা নিজের দেশে পাঠাত।

১৭৯৫-৯৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ বণিকদের ভারত থেকে রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য ছিল ২০.৫ মিলিয়ন টাকা। ১৮১১-১২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এই পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৩৪ মিলিয়ন টাকা। এই সময়ের মধ্যে ইংল্যান্ড কাঁচা তুলো, নীল, চিনিশস্য প্রভৃতি ভারতীয় পণ্য রপ্তানির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাজার ছিল। এক্ষেত্রে এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, ইংরেজ কোম্পানির ভারতে বিনিয়োগ অষ্টাদশ শতকের শেষে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে স্পষ্টতই ছিল ব্রিটিশ অর্থনীতির স্বার্থে ও প্রয়োজনে। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদের কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার লুপ্ত হলেও ব্যক্তিগত বাণিজ্যে যুক্ত ইংরেজ বেসরকারি বণিকরাও ইংল্যান্ডের লাভের জন্যই ভারতে তাদের বাণিজ্য নীতি পরিচালনা করেছিল।

৩.৫ একচেটিয়া কারবারের প্রভাব : ভারতীয় বাজার ও উৎপাদক

কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকারের ফল ভারতীয় বণিক এবং উৎপাদনকারীদের ওপর হয়েছিল অত্যন্ত ক্ষতিকর ও বিধ্বংসী। ভারতীয় বণিকদের কাছ থেকে ভারতীয় বণিকদের সরাসরি পণ্য ক্রয়ের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। নানারকম অর্থনৈতিক এবং অর্থনীতি বহির্ভুত নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ইংরেজ বণিকরা সরাসরি উৎপাদকদের কাছ থেকে কম মূল্য দিয়ে পণ্য ক্রয় করার ব্যবস্থা করে। স্বাধীন ভারতীয় উৎপাদকদের উৎপাদনকেও নিরুদ্যম করা হয় কখনো সরাসরি নানা বিধিনিষেধ আরোপ করে, আবার কখনো রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণকে কাজে লাগিয়ে। কোম্পানির এই ভূমিকা কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সুস্পষ্ট ছিল।

কোম্পানির বাণিজ্য নীতিতে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ভারতীয় রেশমশিল্প। ভারতের রেশম বণিকেরা ১৭৪৯-৫৩'র মধ্যে কাশিমবাজার থেকে ১৯,৫০৩ মণ কাঁচা রেশম ক্রয় করেছিল। ১৭৬৪-৬৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ৬,৮৫৮ মণ। উল্লিখিত সময়ের মধ্যেই রেশম থান কেনার পরিমাণও ১,০৫,৬৫১ থেকে কমে ৭১,৪৯৫ মণ দাঁড়ায়। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের পর মুর্শিদাবাদ থেকে সুরাটে রেশম যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। রেশম বাণিজ্যের সবচেয়ে খারাপ দিক ছিল কাঁচামাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোম্পানির হস্তক্ষেপ। এই

হস্তক্ষেপের ফলে দাদ্‌নি বণিকরা ও বেনিয়ানরা কোম্পানির কর্মচারীদের গোমস্তা বা এজেন্ট হিসেবে বাণিজ্যে অংশ নেবার সুযোগ হারিয়েছিল। ১৭৮৮-৮৯ সাল নাগাদ এজেন্সি ব্যবস্থা গড়ে ওঠার ফলে কোম্পানির বস্ত্র আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে দালালরাও গুরুত্ব হারাল। এজেন্সি হাউসগুলির প্রতিষ্ঠা আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য থেকেও ভারতীয় বণিকদের সম্পূর্ণ বিতাড়িত করে। কিছু ভারতীয় বণিক ইংরেজ বাণিজ্যকুঠিগুলিকে ঋণদান করতে থাকে কিন্তু ঋণদানের শর্ত সম্পূর্ণ ইওরোপীয় বণিকদের পক্ষে যাওয়ার ফলে তারা পুঁজি জমিদারি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ইত্যাদিতে খাটাতে শুরু করল। কোম্পানির একচেটিয়া কারবারের দ্বারা ভারতীয় উৎপাদকরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল।

লবণ এবং আফিম তৈরির ক্ষেত্রেও একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোম্পানির প্রকৃত নজর ছিল রাজস্বের দিকে, বাণিজ্যের দিকে নয়। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে হাউস অফ্ কমন্স-এর তৈরি একটি কমিটির সামনে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে হল্ট ম্যাকেঞ্জি একথা বলেন। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে কোম্পানি লবণ তৈরি করার দায়িত্ব নিজের হাতে নেয় এবং বাংলার বিভিন্ন লবণ উৎপাদনকারী অঞ্চলে যেমন মেদিনীপুরের হিজলীতে, নোয়াখালির ভুলুয়াতে, চট্টগ্রাম এবং যশোরে ইউরোপীয় এজেন্ট নিযুক্ত করে। লবণের দাম ধার্য করে দেয় কোম্পানির গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল। ১৭৮৬-৮৭ সালে কর্নওয়ালিস এই ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন করে বছরের কতকগুলি সময়ে জনসাধারণের মধ্যে নীলামের মধ্যে লবণ সরবরাহের নিয়ম চালু করেন। এই ব্যবস্থায় প্রথমে লবণ প্রস্তুতকারী মোলুঙ্গীদের কাছ থেকে লবণ সংগ্রহ করা হত ও এই লবণ বিভিন্ন লবণ উৎপাদনকারী জেলাগুলির সরকারি গুদামে রাখা হত। এই সংগৃহীত লবণ এরপর সালকিয়ার বড় গুদামে রাখা হত এবং সেখান থেকে বছরে চারবার নীলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হত। এর আগে মোলুঙ্গীরা, যেহেতু তাদের খুব কম পারিশ্রমিকে কাজ করতে হত, তাদের উৎপাদনের একটা অংশ গোপনে দেশীয় বণিকদের বিক্রয় করত। কোম্পানি নানা আইনের মাধ্যমে তাদের এই গোপন ব্যবসা বন্ধ করে দেয়। ফলে মোলুঙ্গীরা অত্যন্ত দারিদ্র্যপীড়িত অবস্থায় পড়ে ও কোম্পানির ঋণের জালে সারাজীবনের মত বাঁধা পড়েছিল।

কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার আফিম চাষীদেরও অর্থনৈতিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিল। এজেন্সি ব্যবস্থায় আফিমের ক্ষেত্রে কোম্পানির এজেন্টরা দাদন হিসেবে রায়তদের অগ্রিম টাকা দিত এবং তাদের কাছ থেকে কাঁচা মাল সংগ্রহ করত। এই কাঁচা আফিম কোম্পানির কারখানাগুলিতে তৈরি করা হত বিক্রয়যোগ্য পণ্যে। রায়তদের দাদন দেওয়া হত তাদের জমির পরিমাপ অনুযায়ী। রায়তরা কোম্পানির এজেন্টদের কাছ থেকে আফিমের মূল্য পেত খুবই কম হারে এবং অনেকসময়ই আফিমের গুণগত মান নিকৃষ্ট এই অছিলায় রায়তদের তাদের প্রাপ্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করা হত। শুধু তাই-ই নয়, আফিম কারখানার নিম্নতম কর্মচারীরা দরিদ্র রায়তদের ওপর উৎপীড়ন চালাত, বলপূর্বক সেলামী আদায় করত ও ওজনের সময় ঠকাত।

সুতি ও রেশম তাঁতিদের ক্ষেত্রেও কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য ক্ষতিকর হয়ে উঠছিল। এক্ষেত্রেও তাঁতিরা অগ্রিম নিয়ে কাজ করত ফলে তারা ক্রমশই কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছিল। তাদের

উৎপাদিত বস্ত্র সংগ্রহ করার আগেই পরিমাণ ও মূল্য ধার্য করে দেওয়া হত। অপরদিকে কঠোর সরকারি নিয়ন্ত্রণের ফলে তাঁতিরা কেবল কোম্পানির কাছেই তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য ছিল। কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার এভাবে দেশীয় বণিকদের ক্ষতিগ্রস্ত করে ও মোলুঙ্গী, রায়ত এবং তাঁতিদের জীবনে বিধ্বংসী প্রভাব ফেলে। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে উইলিয়াম বোল্টস্ লিখেছিলেন, দেশের গরিব উৎপাদক ও কারিগরদের ওপর অকল্পনীয় উৎপীড়ন ও কঠোরতা চালানো হচ্ছে এবং কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের ফলে তারা দাসের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ছে।

৩.৬ পরিবর্তনশীল বাণিজ্যের ধারা

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য আধিপত্যের অবসান ঘটল। একচেটিয়া কারবারের অবসানের ফলে ভারতে ব্রিটিশ পণ্যের আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতে রপ্তানিকৃত ব্রিটিশ পণ্যের মূল্য ছিল ১৮ লক্ষ পাউন্ড। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতে রপ্তানিকৃত ব্রিটিশ পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৪৫ লক্ষ পাউন্ড। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের পর বাংলার আমদানি ও রপ্তানি উভয়ই বৃদ্ধি পায়। ১৮১৩-১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮১৭-১৮ পর্যন্ত বাংলা থেকে ভারতীয় পণ্য রপ্তানি ৪০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সমগ্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ১৮২৮ থেকে ১৮৪০ পর্যন্ত ভারত থেকে ব্রিটেনে রপ্তানিকৃত ভারতীয় পণ্যের মূল্য ছিল ১১৮.২ মিলিয়ন টাকা; ব্রিটেন থেকে ভারতে এসেছিল ৪৮.৮ মিলিয়ন টাকা মূল্যের ব্রিটিশ পণ্য। আপাতদৃষ্টিতে তখনও বাণিজ্যিক ভারসাম্য ভারতের দিকেই ঝুঁকে ছিল একথা মনে হতে পারে। কিন্তু এই নতুন বাণিজ্যধারার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ভারত থেকে কাঁচামাল যেত ব্রিটেনে আর ব্রিটেন থেকে ভারতে আসত শিল্পজাত পণ্য। ১৮১৩ সালে কলকাতা থেকে ব্রিটেনে ২ মিলিয়ন স্টার্লিং মূল্যের সুতিবস্ত্র যায় কিন্তু ১৮৩০ সালে কলকাতা বন্দর ২ মিলিয়ন স্টার্লিং মূল্যের শিল্পজাত সুতিবস্ত্র আমদানি করেছিল। ১৭৯৯-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কলকাতা থেকে ব্রিটেনে ৩,০২৬,২৫৩টি সুতিবস্ত্রের থান রপ্তানি করা হয়েছিল। ১৮২৯-৩০ খ্রিস্টাব্দে এই সংখ্যা কমে হয়েছিল ১,৯৫,৭২৫টি। ১৮১৪ সালে ভারত ৬,৮০,২৩৪ গজ সাদা ও ছাপার কালিকো কাপড় ব্রিটেন থেকে আমদানি করেছিল; ১৮২৮-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৪,৮৪৩,১১০ গজ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ব্রিটিশ বাণিজ্য নীতির কুফল। ভারতে আমদানিকৃত ব্রিটিশ-শিল্পজাত পণ্যের ওপর সাধারণত কোনো শুল্ক ধার্য করা হত না, বা করা হলেও তার পরিমাণ ছিল অত্যন্ত কম কিন্তু ভারতীয় শিল্পজাত পণ্য ব্রিটেনে আমদানি করলে তার ওপর চড়া হারে আমদানি শুল্ক ধার্য করা হত। ফলে শুরু হয়েছিল এক অসম প্রতিযোগিতা। সরকারের এই নীতির মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়লো ভারতীয় শিল্পগুলির ওপর। ভারতে প্রথম পর্যায়ের অবশিল্পায়ন শুরু হয়েছিল।

৩.৭ অবশিল্পায়ন

সাধারণভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় হস্তশিল্পের বিপর্যয়কে ঐতিহাসিকরা অবশিল্পায়ন বলে অভিহিত করেছেন। অবশিল্পায়ন বলতে বোঝায় শিল্পায়নের বিপরীত, শিল্পের অধোগতি। শিল্পায়নের লক্ষণ হল কৃষিকার্য

থেকে উৎপন্ন জাতীয় আয়ের অংশের তুলনায় অনুপাতে শিল্পকর্ম থেকে উৎপন্ন অংশ বাড়ে, শিল্পকর্মে নিযুক্ত জনসংখ্যা কৃষিকর্মে নিয়োজিত মানুষের অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। এর বিপরীত যখন ঘটে, অর্থাৎ যদি দেশের মানুষ শিল্পকর্ম ছেড়ে কৃষি দ্বারা জীবিকা অর্জন করতে শুরু করেন, অর্থাৎ জাতীয় আয়ে কৃষিজ অংশ বাড়তে এবং শিল্পজ অংশ কমতে থাকে, তাকে অবশিল্পায়ন বলা যায়।

ঔপনিবেশিক ভারতে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ এই অবশিল্পায়নের ধারার ওপর জোর দিয়েছিলেন। রমেশ দত্ত, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, সখারাম গণেশ প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ অবশিল্পায়ন বলতে বুঝিয়েছেন দেশীয় শিল্পের অবক্ষয়—ভারতীয় শিল্পের অবক্ষয় ও কুটিরশিল্পের ধ্বংস। পরবর্তীকালে রজনীপাম দত্ত, গ্যাডগিল, সারদা, রাজু, নরেন্দ্রকৃষ্ম সিংহ ইত্যাদি ঐতিহাসিকগণ প্রায় একই কথা বলেছেন। অবশিল্পায়নের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন অমিয় বাগচী।

জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদগণ তৎকালীন বিভিন্ন উপাদান থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে আঠারো শতক অবধি ভারতীয় কুটিরশিল্পের অবস্থা যা ছিল তার ক্রমিক অবনতি দেখিয়েছেন উনিশ শতকের শুরু থেকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে আমদানি-রপ্তানির হিসেবে দেখা যায় যে, কুটিরশিল্পজাত শিল্পদ্রব্যের রপ্তানি একদিকে কমেছে, অপরদিকে শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি বেড়েছে। বিশেষ করে সুতির কাপড়ের আমদানি বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। রমেশ দত্তের মতে, উনিশ শতকের গোড়ায় রপ্তানি কমার অর্থ দাঁড়াল এই যে দেশী শিল্প বিদেশী বাজার হারাল এবং আমদানি বাজার স্বদেশের বাজার থেকেও দেশী শিল্পপণ্য উৎখাত হল।

ঐতিহাসিকরা অবশিল্পায়নের ভিন্ন ভিন্ন কারণ উপস্থাপনা করেছেন। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল তাকেও কারণ হিসেবে অনেক সময় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু হরিরঞ্জন ঘোষাল এবং সারদা রাজু যথাক্রমে বাংলা এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির ক্ষেত্রে দেখিয়েছেন যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সূতিবস্ত্র শিল্পের কেবল সাময়িক ক্ষতি করেছিল, স্থায়ী অবনতি ঘটায়নি। ডি. আর. গ্যাডগিলের মতে, অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে বহু দেশীয় রাজা-মহারাজাগণ ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন। তাঁদের দরবারে যে সৌখিন বস্ত্রের চাহিদা ছিল এর ফলে তা হ্রাস পায়। অবশিল্পায়নেরও এও একটি কারণ। এছাড়াও ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয়রা উনিশ শতকে সাহেবদের অনুকরণে বিলিতি কাপড় ও আমদানিকৃত শহুরে বিলাসদ্রব্যের দিকে ঝোঁকেন। দেশের উঁচুদরের শহুরে শিল্পগুলি এর ফলস্বরূপ পূর্বতন বাজার হারায়। যদিও এগুলি ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের স্থায়ী অবনতির কারণ ছিল কিনা তা বিতর্কসাপেক্ষ কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, ভারত তার স্বকীয় শিল্পকর্ম হারিয়ে ইংল্যান্ডের শিল্পদ্রব্যের বাজারে পরিণত হল এবং কেবলমাত্র কৃষির ওপর নির্ভরশীল হয়ে ইংল্যান্ডের কৃষিক্ষেত্র হয়ে টিকে রইল।

ভারতে এই অবশিল্পায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই। অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সস্তায় শিল্পদ্রব্য ভারত থেকে কিনে ইউরোপে বিক্রি করার লোভে ক্রমাগত ভারতীয় কারিগরদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। মুক্ত বাণিজ্যের হোতা ইংল্যান্ডের প্রতিভূ হওয়া সত্ত্বেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রকৃতপক্ষে গায়ের জোরে একচেটিয়া ব্যবসার ফাঁদে বাংলার তাঁতিদের আটকেছিল। অত্যধিক শোষণের ফলে তাঁতি ও অন্যান্য উৎপাদকদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়েছিল এবং একই সঙ্গে বাজার

থেকে দেশী পুঁজি পিছু হটে গেল। মাদ্রাজে, বাংলায়, বিহারে, অন্ধ্রপ্রদেশে, গুজরাটে সর্বত্রই শিল্পের দুরবস্থা দেখা দিল। এর ওপরে এসে পড়ল ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের ধাক্কা। প্রকৃতপক্ষে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে সনদের মাধ্যমে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার লুপ্ত হবার পর এবং মুক্ত বাণিজ্যনীতি গৃহীত হওয়ার পরই ভারতে অবশিল্পায়ন ঘটতে শুরু করল। ভারতীয় কুটির শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানি হ্রাস করে কাঁচামাল ইংল্যান্ডে পাঠানো হতে লাগল এবং সস্তা ইংল্যান্ডের মিলের তৈরি কাপড় আমদানি বৃদ্ধি করে ভারতীয় বাজার ভরিয়ে ফেলা হল। বিলিতি কাপড়ের অনুপ্রবেশ সহজতর করার জন্য আমদানিকৃত মিলের কাপড়ের ওপর শুল্ক কমিয়ে দেওয়া হল। ১৮১৫ সালে ইংল্যান্ডের শিল্পজাত বস্ত্রের ওপর মাত্র $২^{১}/_{২}\%$ আমদানি শুল্ক ধার্য করা হল অথচ ১৮১৩ সালে বাংলার মস্‌লিনের ওপর ৪৪% এবং ক্যালিকো ও ডিমিটি কাপড়ের ওপর ৮৫% আমদানি শুল্ক ধার্য করা হয়েছিল। ম্যানচেস্টারের মিলে তৈরি কাপড় যখন ভারতীয় বাজার ছেয়ে ফেলল তাঁতশিল্পে এক অভূতপূর্ব বিপর্যয় দেখা দিল। সস্তা মিলের কাপড় প্রভূত পরিমাণে আসার ফলে দেশী কাপড়ের চাহিদা কমল তো বটেই সেই সঙ্গে ইংল্যান্ডের কারখানাগুলির জন্য কাঁচামাল রপ্তানি করার ফলে ভারতীয় তাঁতি ও কারিগরেরা কাঁচামালের সমস্যায় পড়লো। উপরন্তু ইংল্যান্ড ভারতীয় শিল্পপণ্যের ওপর চড়া হারে আমদানি শুল্ক ধার্য করার ফলে ভারতীয় শিল্পজাত পণ্য কেবল ইংল্যান্ডই নয় বিশ্বের অন্যান্য স্থানের বাজারও হারালো। ঊনবিংশ শতকে ভারতে কুটিরশিল্পের অবলুপ্তির বা অবশিল্পায়নের প্রধান কারণ ছিল ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের ধাক্কা। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের অবাধ বাণিজ্যনীতি ভারতীয় শিল্পের জন্য এক অমঙ্গলজনক ইঙ্গিত নিয়ে এসেছিল।

৩.৭.১ অবশিল্পায়ন ও সুতিবস্ত্র শিল্প

ঐতিহাসিক রমেশ দত্ত সুতিবস্ত্র শিল্পের অবলুপ্তিকে ভারতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে দুঃখজনক অধ্যায় বলে বর্ণনা করেছেন। অবশিল্পায়নের প্রক্রিয়ায় বস্ত্রশিল্পের সঙ্কটকেই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলা যেতে পারে। অসংখ্য তাঁতি, সুতো-কাটুনি, রঞ্জক, ধোলাইকর, ধুনুরী, সূচিশিল্পী এবং সুতি ও রেশমশিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে। কাজের অভাবে কোম্পানি নিজেই সুতিবস্ত্র ও রেশমবস্ত্র উৎপাদনের কেন্দ্রগুলি তুলে দিতে থাকে। ১৮১৮ থেকে ১৮২৫ সালের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কুঠি ও শিল্পকেন্দ্রগুলি একের পর এক বন্ধ হয়ে যায়। ১৮১৮ সালে ঢাকার কুঠি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৮১৯-এ উঠে যায় শান্তিপুর ও পাটনার কুঠি। উঠে যাওয়া কুঠিগুলিতে কর্মরত কারিগর এবং তাঁতিরা কর্মহীন হয়ে পড়ে। কেবলমাত্র বাংলাতেই ১০ লক্ষ লোক জীবিকা হারিয়েছিল বলে জানা যায়। সমসাময়িক সরকারি দলিলপত্র থেকে পশ্চিম ভারতের সুরাট, আমেদাবাদ, ব্রোচ, পুনা, শোলাপুর ইত্যাদি স্থানের এবং দক্ষিণ ভারতের কোয়েম্বাটুর, বেলারি, তিনেভেল্লি, মাদুরা ইত্যাদি কেন্দ্রের তাঁতশিল্পীদের চরম দুর্দশার কথা জানা যায়। এইসব পেশাচ্যুত শিল্পী ও কারিগরদের বিকল্প কর্মসংস্থানের তীব্র সঙ্কট দেখা দিয়েছিল—অধিকাংশ কৃষিকাজে লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করল। কৃষির ওপর চাপ বৃদ্ধি পেল। জনসংখ্যার প্রায় ৮০% থেকে ৮৬% হয়ে পড়ল কৃষির ওপর নির্ভরশীল, ফলে সামগ্রিকভাবে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হল। কারিগরদের মধ্যে অনেকেই ক্ষেতমজুর বা কুলির কাজ করতে বাধ্য হল। দক্ষিণ ভারতের বহু তাঁতি কর্মসংস্থানের খোঁজে স্বদেশ ত্যাগ করে সিংহল, বর্মা, মরিশাসে চলে গেল। এই কারিগর ও তাঁতিদের দুরবস্থা সামগ্রিকভাবে চিত্রিত করা সম্ভব

হয়নি। একদিকে তাদের পুরোনো পেশার দ্বারা জীবিকা অর্জনের সুযোগ নষ্ট হয়ে গেল অথচ বিকল্প কর্মসংস্থানকারী কলকারখানাও গড়ে উঠল না, ফলে হস্তশিল্পের ওপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা এক চরম দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হল।

জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদদের ও পরবর্তী ঐতিহাসিকদের লেখায় অবশিল্পায়নের যে চিত্র পাওয়া যায় তার বিরুদ্ধে ষাটের দশকে কিছু ঐতিহাসিক প্রশ্ন তুলতে থাকেন। বিতর্ক সৃষ্টি হয় যে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রভাবে ভারতে অবশিল্পায়ন আদৌ ঘটেছিল কিনা। মার্কিন ঐতিহাসিক মরিস ডি. মরিস মনে করেছেন অবশিল্পায়ন আদৌ কখনো ঘটেনি, উনিশ শতকেও নয়। মরিসের মতে, জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ শিল্পদ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধি মানেই অবশিল্পায়ন একথা ভেবে ভুল করেছেন। যদি জনসংখ্যা এবং জাতীয় আয় বাড়ে তবে দেশী শিল্প অক্ষুণ্ণ থেকেও আমদানি বাড়তে পারে। দ্বিতীয়ত, শিল্পদ্রব্যের আমদানির ফলে একটি বিশেষ ধরনের দেশী শিল্পের ক্ষতি হলেও অন্য শিল্পের বৃদ্ধি ঘটতে পারে। উনিশ শতকের গোড়ায় সুতো আমদানিতে সুতো-কাটুনিরা ঘা খেল কিন্তু তাঁতিরা সস্তায় সুতো পেয়ে সস্তা কাপড় বানাতে পারল, বিদেশী কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে পারল। তৃতীয়ত, মরিসের মতে, অনেকগুলি প্রাচীন কুটিরশিল্প ম্যানচেস্টার, শেফিল্ড, বামিংহামের উৎপাদন আমদানি করা সত্ত্বেও বেঁচে থাকলো। এর কারণ কুটিরশিল্পের একটি নিজস্ব বাজার ছিল যেখানে বিদেশী প্রতিযোগিতা ছিল না যেমন পট্টবস্ত্র বা মোটা কাপড়। এসব ক্ষেত্রে কুটিরশিল্প টিকে গিয়েছিল। মরিসের বক্তব্যের মধ্যে কিছু ফাঁক থাকায় এই যুক্তিকে গ্রহণীয় বলে অনেক ঐতিহাসিকই মনে করেন না। তাঁর যুক্তির গোড়ায় গলদ হল এই যে এমন কোনো প্রমাণ নেই যে জনসংখ্যা ও মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় বাড়ার ফলে উনিশ শতকে বাজারের আয়তন বাড়ে এবং তার ফলে আমদানি ও দেশী দুই ধরনের শিল্পদ্রব্যেরই জায়গা ছিল। অতএব, দেশী শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। মরিসের বক্তব্য গ্রহণীয় নয় কারণ উৎপাদিত মোটা তাঁতবস্ত্র আঘাত পায় ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে, রেল লাইন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে। একই ধরনের বক্তব্য উপরস্থিত করেছেন মারিকা ভিজিয়ানি এবং পিটার হারনেটি। মূলত তাদের বক্তব্য হল আদমসুমারির হিসাব এবং বাণিজ্য-সংক্রান্ত সরকারি তথ্য সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। গ্রামীণ তাঁতশিল্প প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে পেরেছিল বলেও তারা মনে করেন। এই বক্তব্যের অনুরূপ মত পাওয়া যায় তীর্থঙ্কর রায় ইত্যাদি ঐতিহাসিকদের বক্তব্যের মধ্যে।

জাপানী ঐতিহাসিক তরু মাৎসুই তাঁর আলোচনায় তথ্য সহকারে দেখিয়েছেন যে ঊনবিংশ শতকে তাঁতিদের সংখ্যা কমে যায় এবং তাদের অবস্থার কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতিও প্রমাণ করা যায় না। মাৎসুই এবং ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন যে, যে পরিমাণ সুতো আমদানি করা হয়েছিল তার থেকে অনেক পরিমাণ বেশি তৈরি কাপড় এদেশে এসেছিল। অমিয় বাগচী ও তাঁর পরিসংখ্যানগত তথ্যের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন ১৮০৯-১৩ সাল থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে গাঙ্গেয় বিহারে কুটিরশিল্পের ওপর নির্ভরশীল কারিগরদের সংখ্য ১৮% থেকে ৮% নেমে এসেছিল। অতএব, উনিশ শতকের ভারত ইতিহাসে অবশিল্পায়ন কোনো অতিকথা নয়—একটি বাস্তব সত্য। ঔপনিবেশিক শাসন এই অবশিল্পায়ন ঘটিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিকে পশ্চাদবর্তী করে তুলেছিল। পরবর্তী পর্যায়ের ব্রিটিশ-বিরোধী বহু আন্দোলনকে বুঝতে গেলে হস্তশিল্পীদের দুদর্শাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে মনে রাখতে হবে।

৩.৮ আর্থিক নিষ্ক্রমণ বা সম্পদ নির্গম (Economic Drain)

ঔপনিবেশিক শাসন কীভাবে ভারতীয় শিল্পকে ধ্বংস করেছিল পূর্ববর্তী বিভাগে আমরা তা আলোচনা করেছি। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রত্যক্ষ ফল ছিল ভারতীয় সম্পদের বহির্গমন। ১৮৭০-এর দশক থেকে জাতীয়তাবাদী অভিযোগের প্রধান স্থায়ী বিষয় হয়ে উঠেছিল—সম্পদ নির্গম। সার্বিকভাবে আর্থিক নিষ্ক্রমণ বা economic drain বলতে বোঝায় একটি উপনিবিশের সম্পদ যখন ঔপনিবেশিক শক্তি রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিজের দেশে নিয়ে যায়, তার পরিবর্তে উপনিবেশকে কিছুই দেয় না এবং উপনিবেশি থেকে অর্জিত পুঁজি উপনিবেশের অনুৎপাদক ক্ষেত্রে ব্যবহার করে যা কখনোই সার্বিক আর্থিক উন্নয়নের সহায়ক হয় না। ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীরাও যেমন ফ্রান্সিস, ওয়ারেন হেস্টিংস, জন লোর বিভিন্ন সময়ে এই সম্পদের নির্গমন সম্ভবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন। জন লোর লিখেছিলেন যে, ভারতবর্ষের সমৃদ্ধ যুগের অবসান হয়েছে; ভারতবর্ষের যে বিপুল পরিমাণ সম্পদ ছিল তা চালান করা হয়েছে এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সমৃদ্ধির জন্য তার শক্তিকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে।

দেশে সমালোচনার মুখে পড়লেও ইউরোপীয় ব্যবসাদাররা ভারতে সোনা নিয়ে আসতে বাধ্য হয় বাণিজ্যের খাতিরে। এর অন্যতম কারণ পশ্চিম ভারতীয় সূতি ও রেশম কাপড়ের বিস্তৃত ইউরোপীয় বাজার। ভারতে কিন্তু পশ্চিমী উৎপাদনের বাজার ছিল তুচ্ছ। কিন্তু ঘটনাক্রম নাটকীয় মোড় নিল পলাশীর যুদ্ধের ফলে। প্রকৃতপক্ষে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ কোম্পানি তথা বেসরকারি ইংরেজ বণিকরা বাংলাদেশ থেকে বিপুল সম্পদ লুঠ করতে থাকে। শাসক বদলের রাজনীতির দ্বারা নজরানা ও পারিতোষিক হিসেবে ইংরেজরা বিপুল পরিমাণ সম্পদ হস্তগত করে। শুল্কহীন অন্তর্দেশীয় ব্যবসার মুনাফা ও দেওয়ানি রাজস্বের উদ্বৃত্তও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। পলাশীর পরবর্তী যুগকে ইংরেজ ঐতিহাসিক পার্সিভাল স্পীয়ারই খোলাখুলি ও নির্লজ্জ লুণ্ঠনের যুগ বলে অভিহিত করেছেন।

ঐতিহাসিকগণ মনে করেন বাংলা থেকে আর্থিক নির্গমন মূলত দুটি ধারায় হতে থাকে। প্রথমত, ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত বেসরকারি বণিকদের বাণিজ্যের মাধ্যমে; দ্বিতীয়ত, কোম্পানি অনুসৃত সরকারি আর্থিক বাণিজ্যিক নীতির মাধ্যমে।

কোম্পানির কর্মচারী ও বেসরকারি বণিকদের লোভ বাংলার অর্থনীতির ওপর চরম আঘাত হেনেছিল। পলাশীর পরবর্তীকালে বাংলার রাজনীতিতে নবাব বদলের ব্যবসা করে ইংরেজ কর্মচারীরাও প্রচুর লাভ করে। অবৈধভাবে সম্পদ লাভ করার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন লর্ড ক্লাইভ। ক্লাইভকে অনুসরণ করে ইংরেজ কর্মচারীরা ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রায় ৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছিল। এছাড়াও কত অর্থ লিখিত প্রমাণ ছাড়াও ইংরেজরা হস্তগত করে তার কোনো হিসেব পাওয়া যায় না।

দেওয়ানি লাভের পর রাজস্বের উদ্বৃত্তও ইংরেজ কোম্পানির হাতে আসে। ওয়ারেন হেস্টিংস যখন বাংলার গভর্নর-জেনারেল ছিলেন তিনি অবৈধভাবে বিপুল উপার্জনের পথ প্রশস্ত করেছিলেন এবং তার প্রিয়পাত্রদের সঙ্গে বে-আইনি চুক্তি করে তাদেরও এর ভাগ দিয়েছিলেন। কোম্পানির এজেন্টরা উৎপাদকদের কাছ থেকে

পণ্য ক্রয় করার জন্য দামের একাংশ সেলামী হিসেবে নিয়ে তাদের লাভ বৃদ্ধি করত। এইভাবে সংগৃহীত অর্থ কিন্তু প্রকৃত ভারতীয় উন্নয়নকে কোনভাবেই সাহায্য করেনি। রমেশ দত্ত তাঁর গ্রন্থ 'ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাসে ১৭৯২-৯৩ থেকে ১৮৩৭-৩৮ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বারা সংগৃহীত রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের একটি তালিকা দিয়েছেন। এই তালিকা দ্বারা তিনি দেখিয়েছেন কী পরিমাণ উদ্বৃত্ত আয় কোম্পানির শেয়ারের অধিকারীদের লভ্যাংশ হিসেবে দিতে ব্যয় হত। তা সত্ত্বেও ভারতীয় ঋণের অঙ্ক বৃদ্ধি পেয়েছিল যার ফল ভুগতে হয়েছিল ভারতীয়দেরই। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে মন্টগোমারি মার্টিন লিখেছিলেন যে, অর্ধশতাব্দী ধরে ভারতবর্ষ থেকে প্রতি বছর প্রায় দুই থেকে তিন মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং ব্রিটেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যা দিয়ে কোম্পানির বাণিজ্যিক ব্যয়, ঋণের জন্য দেয় সুদ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় মেটানো হচ্ছে যে সম্পদ কোনোভাবেই ভারতবর্ষে ফেরৎ আসছে না।

কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা নানাভাবে বিপুল সম্পদ আহরণ করেছিল তার সবটাই তারা নিজেদের দেশে চালান দিত বিভিন্ন উপায়ে। কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা তাদের রোজগারের একটা বড় অংশ দেশে পাঠাত মূল্যবান পাথরের মাধ্যমে। এইভাবে অসংখ্য মূল্যবান রত্নসামগ্রী ভারতের বাইরে চলে গেল। বেসরকারি ইংরেজ বণিকরা তাদের অর্জিত মুনাফা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তহবিলে জমা রাখত, তারপর তারা ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়ে কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টরসের কাছে বিল-অফ্-এক্সচেঞ্জের দ্বারা তা ভাঙিয়ে নিত। এই পদ্ধতিতে তারা সন্তুষ্ট ছিল না কারণ এর বিনিময় হার তাদের কাছে আকর্ষণীয় ছিল না। আগেই বলা হয়েছে যে, বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে তারা ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি অন্য ইউরোপীয় কোম্পানির মধ্যমে দেশে টাকা পাঠাতে লাগল এবং ইউরোপীয় কোম্পানিগুলিও ভারতীয় পণ্য ক্রয় করার জন্য এই টাকাই পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করতে লাগল। পরিস্থিতি দাঁড়াল এই যে, বাংলা থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ দ্বারাই বাংলা তথা ভারতের পণ্য ক্রয় করা হতে লাগল ফলে ভারতীয় অর্থনীতি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। পরবর্তীকালে বেসরকারি বণিকরা যখন এজেন্সি হাউসগুলির মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠাতে লাগল অবস্থার কোনো পরিবর্তনের কোনো সুযোগ রইল না। এইভাবে চলতে থাকল বাংলার আর্থিক নিষ্ক্রমণ।

ইংরেজ কোম্পানির সরকারি নীতিও এই নির্গমনকে বাড়িয়ে তুলছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে দ্রুতহারে বাংলার সম্পদ বাইরে চলে যেতে থাকে। এটি ছিল সম্পদ নির্গমের এক নির্লজ্জ রকমের সুস্পষ্ট প্রক্রিয়া। ভারতীয় পণ্য কেনার জন্য কোম্পানি যে ব্যয় করত তাকেই বলা হত বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগের মাধ্যমেই সম্পদ নির্গমকে আরও সহজ করে তোলা হয়েছিল। ১৭৫৭ সালের আগে পর্যন্ত কোম্পানি ভারতীয় পণ্য ক্রয় করার জন্য ইংল্যান্ড থেকে প্রচুর পরিমাণ সোনা, রূপা বা বুলিয়ন আমদানি করত। ১৭৫৭ থেকে কোম্পানির এই নীতি পরিবর্তিত হয় কারণ এই পলাশীর পরে যে সম্পদ ইংরেজরা হস্তগত করেছিল তা কাজে লাগানো হল বাংলা থেকে রপ্তানি মাল কেনার জন্য। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি লাভের পর থেকে পরিস্থিতি একেবারেই পাল্টে যায়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের পর বাংলায় বুলিয়ন বা সোনা, রূপো আসা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। ১৭৬৫-৬৬ থেকে ছয় বছরে ইংরেজ কোম্পানি আদায়ীকৃত নিট রাজস্বের ৩০.৮ শতাংশ রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য বিনিয়োগ খাতে ব্যয় করেছিল।

ম্যানচেস্টারের প্রতিযোগিতার সামনে ভারতীয় সূতিবস্ত্র ও রেশমজাত দ্রব্যের রপ্তানি কমে যায় ফলে কোম্পানি তার কর্মচারী ও ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত বণিকদের সবার সামনেই টাকা পাঠানোর সমস্যা দেখা দিয়েছিল। নীলের চাষ ও চা কেনার জন্য চীনে আফিম রপ্তানি করে প্রথমে এই সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হয়। চীনের চা ও রেশম দ্রব্য ইংরেজ কোম্পানি বাংলা থেকে প্রচুর পরিমাণ সোনা ও রূপো চীনে পাঠাতে শুরু করল। এছাড়াও প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহ, অষ্টাদশ শতকের শেষে ও ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের ব্যয় মেটানোর জন্যও বাংলা থেকে আহৃত আয় ব্যবহৃত হতে লাগল। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে জেম্‌স গ্রান্ট তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন যে, সামগ্রিকভাবে বাংলার আর্থিক নিষ্ক্রমণের পরিমাণ ছিল ১৮,০০০,০০০ টাকা। ঐতিহাসিক হোল্ডেন বারবার দেখিয়েছেন যে, ইংরেজ কোম্পানি তার বিনিয়োগ এবং চীনে সোনা, রূপো রপ্তানির মাধ্যমে ১৭৮৩-৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৯২-৯৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলা থেকে বছরে ১.৭৮ মিলিয়ন পাউন্ড সম্পদের নির্গমন হয়েছিল। ইরফান হবিব বলেছেন, ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষ থেকে ৪.২ মিলিয়ন পাউন্ড আর্থিক নিষ্ক্রমণ হয়েছিল এবং তা ছিল ব্রিটেনের জাতীয় আয়ের ২ শতাংশেরই বেশি ও তদানীন্তন ব্রিটেনের অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের প্রায় ৩০ শতাংশ। ১৮৫০-এর দশকের পর শুরু হয়েছিল অন্য এক পর্যায় যখন ভারত থেকে নতুন ধরনের রপ্তানির—যেমন পশ্চিম ভারতের তুলো, পাঞ্জাবের গম, বাংলার পাট, আসামের চা, দক্ষিণ ভারতের তৈলবীজ ইত্যদির দ্রুত বিস্তার ঘটে এ কাজ আরও সফলভাবে করা হল। ভারত থেকে ব্রিটেনে তহবিল হস্তান্তরের সমস্যা থেকেই যায়, প্রয়োজনও থেকে যায় এবং তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময়ে লভ্যাংশ মেটানোর দায়ের বদলে ১৮৫৮'র পর থেকে শুরু হয় ভারত সচিবের ভারত দফতরের খরচ। স্বরাষ্ট্র ব্যয় ও ব্যক্তিগত সূত্রে পাঠানো টাকা, দুই-ই চালান করা হতে থাকে ভারতীয় রপ্তানির মাধ্যমে। ভারতের ক্রমবর্ধমান রপ্তানি উদ্বৃত্তের ভিতর দিয়ে তাই প্রতিফলিত হল সম্পদ নির্গমের প্রক্রিয়াটিই। অবাধ বাণিজ্যের মাধ্যমে শোষণের পদ্ধতি ও ব্রিটিশ ভারতীয় লগ্নি পুঁজিবাদের গড়ন—এই দুইয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ব্যবসাগত নির্গম।

৩.৯ সারাংশ

ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের ওপর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। রাজনৈতিক ও অর্থনীতি বহির্ভুত নানা কৌশল অবলম্ভবন করে কোম্পানি ভারতীয় উৎপাদকদের থেকে সস্তায় শিল্পজাত দ্রব্যক্রয় করে ইউরোপের বাজারে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করার লক্ষ্যে তাদের বিনিয়োগ নীতি পরিচালিত করেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। এ সময়ে ভারতীয় শিল্পদ্রব্য ইওরোপের বাজারে যেত। এই দ্রব্য ক্রয় করার জন্য ইংল্যান্ড থেকে আসত বুলিয়ন অর্থাৎ সোনা বা রূপো। কিন্তু কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যে অধিকার একদিকে উৎপাদকদের ওপর চাপ ও অত্যাচারের সৃষ্টি করতে লাগল, অপরদিকে ভারতীয় পুঁজিকে নিরুদ্যম করছিল ফলে ভারতীয় পুঁজি শিল্পক্ষেত্র থেকে ক্রমে সরে যেতে বাধ্য হল। বাণিজ্যের এই ধারা ক্রমশ পরিবর্তিতত হচ্ছিল ইংল্যান্ডের স্বার্থে। ১৭৫৭'র পলাশির যুদ্ধে জয় এবং ১৭৬৫-তে দেওয়ানি লাভ কোম্পানিকে আরও

সুবিধাজনক অবস্থায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। কোম্পানি উদ্বৃত্ত রাজস্ব দ্বারা ভারতীয় পণ্য ক্রয় করতে লাগল এবং কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত বাণিজ্যের দ্বারা আহৃত অর্থ দেশে নানাভাবে পাঠিয়ে দিতে লাগল। ভারতীয় অর্থে ভারতীয় পণ্য ক্রয়ের ফলে সোনা এবং রূপোর আমদানি কমে আসতে লাগল। ভারতীয় আফিম উৎপাদন বাড়িয়ে, তা চীনে পাঠিয়ে এই প্রক্রিয়াকে আরও সহজতর করা হয়েছিল। শুরু হয়েছিল ভারত থেকে সম্পদ নির্গমের প্রথম পর্যায়।

ভারতীয় শিল্পজাত পণ্য ক্রমে বিদেশের বাজার হারাতে লাগল ও ইংল্যান্ডের শিল্পজাত দ্রব্য ভারতে প্রবেশ করে দেশী বাজার দখল করে নিতে লাগল; পরিবর্তে ভারতীয় রপ্তানি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল কাঁচামাল রপ্তানিতে—ইংল্যান্ডের কৃষিক্ষেত্র হিসাবে। ১৮১৩'র সনদে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার লুপ্ত করে তুলল। ভারতীয় শিল্পের ধ্বংস ও অবশিল্পায়নের প্রক্রিয়া দেশীয় অর্থনীতিকে পশ্চাদবর্তী করে তুলেছিল। একদিকে ভারতীয় সম্পদের বহির্গমন অপরদিকে দেশী শিল্পের ক্রমিক অবনতি ও ধ্বংস—এই দুই ধারায় ঔপনিবেশিক শোষণ ভারতীয় অর্থনীতিকে পঙ্গু করে তুলেছিল।

৩.১০ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কোম্পানির বাণিজ্য নীতি কী ছিল?

২। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার ভারতীয় বাজার ও উৎপাদকদের ওপর কী প্রভাব বিস্তার করেছিল?

৩। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদের প্রত্যক্ষ ফল কী হয়েছিল?

৪। বাংলা থেকে আর্থিক নিষ্ক্রমণ মূলত যে দুটি ধারায় হতে থাকে তার উল্লেখ করুন।

শূন্যস্থান পূর্ণ করুন :

১। —— খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট ফারুকশিয়ারের ফরমান ইংরেজ কোম্পানিকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার দেয়।

২। এজেন্সি হাউসগুলি গড়ে ওঠার আগে —— ইংরেজদের পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দালালের কাজ করত।

৩। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের সনদের মাধ্যমে —— বাণিজ্যে লিপ্ত বণিকরা কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিয়েছিল।

৪। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির —— বাণিজ্য আধিপত্যের অবসান ঘটল।

নিচের উক্তিগুলির কোন্‌টি ঠিক (✓) এবং কোন্‌টি ভুল (×) চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন :

১। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট ফারুকশিয়ারের ফরমান ইংরেজ কর্মচারীদের বিনা শুল্কে বাণিজ্য অধিকার দিয়েছিল।

২। লবণ এবং আফিম তৈরির ক্ষেত্রেও একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোম্পানির প্রকৃত নজর ছিল বাণিজ্যের দিকে।

৩। সাধারণভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় হস্তশিল্পের বিপর্যয়কে ঐতিহাসিকরা অবশিল্পায়ন বলেছেন।

৪। ইংরেজ কোম্পানির সরকারি নীতি বাংলা থেকে আর্থিক নির্গমন বন্ধ করেছিল।

৩.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। সরকার, সুমিত : আধুনিক ভারত, ১৮৮৫-১৯৪৭।

২। Sinha, N. K. : The Economic History of Bengal, vol-I and III.

৩। Ghosal, H. R. : Economic Transition in the Bengal Presidency.

৪। Dutt, Romesh : The Economic History of India vol-I.

৫। Chatterjee, Suranjan and Guha Roy Siddhartha : History of Modern India.

৬। ভট্টাচার্য, সব্যসাচী : ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি, ১৮৫০-১৯৪৭।

৭। Tripathi, Amalesh : Trade and Finance in the Bengal Presidency, 1793-1833.

৮। Bagchi, A. K. : The Political Economy of Underdevelopment.